অগস্ট ২০০৩ দশ টাকা

ছোটদের মাসিক পত্র

আনন্দমেলা

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

জমজমাট রঙিন কমিকসের শেষাংশ

নানা স্বাদের ছ'টি গল্প

- দু'সংখ্যায় সমাপ্য উপন্যাসের শেষ কিস্তি
- লাল-হলুদে মাত আসিয়ান কাপ
- ক্যাম্পাস কুইজ মজার খেলা

আনন্দমেলা আগস্ট ২০০৩
'আনন্দবাজার পাবলিকেশন'

স্বপ্নপুরী

দীপা তলাপাত্র

ডোর বেলের মিষ্টিমধুর বাজনাটা বারবার জানাতে থাকে দরজাটা খুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু রানা চুপচাপ বসেই থাকে। ভাবে, আরেকটু বাজুক, শুনি। ডোরবেলের বাজনাটা তাকে এক মুহূর্তে ছেলেবেলার দিনগুলোতে নিয়ে যায়। বিলেত থেকে ফেরার পর এই একটা নেশা রানাকে পেয়ে বসেছে। ডোর বেলের বাজনা শুনে-শুনে তার যেন আশ মিটতেই চায় না। মনে হয় বেজে যাক, অনন্তকাল ধরে বেজে যাক।

কিন্তু দরজার ওপারে যে আরেকজন ক্রমশ অধৈর্য হয়ে আঙুলের চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছে, সেটুকু খেয়াল পর্যন্ত থাকে না রানার। আচ্ছা, এটা কী বেঠোফেনের সুর? রানা জানে না। শুধু জানে, যখন তারা 'স্বপ্নপুরী'তে প্রথম এল, মা তখন এই ডোর বেলটা লাগিয়েছিলেন। এর সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। পুরনো বাড়ি থেকে ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে যখন শ্যাম এল, তখনও ডোর বেলটা ঠিক এভাবেই বেজেছিল। মনে হলে বুকের ভিতরটা ভীষণ মোচড় দিয়ে ওঠে রানার। তবু আগের মতো আবার মায়ের রুচির তারিফ না করে পারল না রানা।

অদ্ভুত মিষ্টি সুরে বাজতেই থাকে ডোর বেলটা। রানা উঠতেই ভুলে যায়। এই মুহূর্তে বাড়ি একদম ফাঁকা বললেই চলে। শুধু মা ঠাকুরঘরে। বসার ঘরে হালকা নীল ডোর বেলের সুরে রানা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে একেবারে।

মায়ের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙে রানার। "কী রে, তুই এখানে, অথচ দরজাটা খুলছিস না কেন? আমি পুজোর ঘর থেকে দৌড়ে এলাম! কখন থেকে বেলটা বাজছে!"

ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে দেয় রানা। দরজার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে চিনতে পারল না, কখনও দেখেছে বলে মনেও করতে পারে না।

হলুদ রঙের জরিপাড় শাড়ি, হলুদ রঙের ব্লাউজ, মাথায় এলো খোঁপা, কাঁধে ব্যাগ, মুখে হালকা প্রসাধনের ছাপ। গভীর কালো বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ। রানা অবাক হয়ে দেখছিল। এক কথায় অপরূপা।

তাকে অবাক করে দিয়ে অপরূপা বলে উঠল, "আপনি রানা তো? আমাকে চিনতে পারছেন না? না পারারই কথা অবশ্য। তবে আশা করি মামণি আমাকে চিনবেন। আচ্ছা, ভেতরে আসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই!" অপ্রস্তুতে পড়ে যায় রানা। "আপনি ভেতরে এসে বসুন! আমি মাকে ডাকছি। মা আবার পুজোর ঘরে চলে গিয়েছেন।"

"থাক ডাকতে হবে না। মামণির পুজো শেষ হলে উনি নিজেই আসবেন।" তারপর অত্যন্ত কৌতূহলের

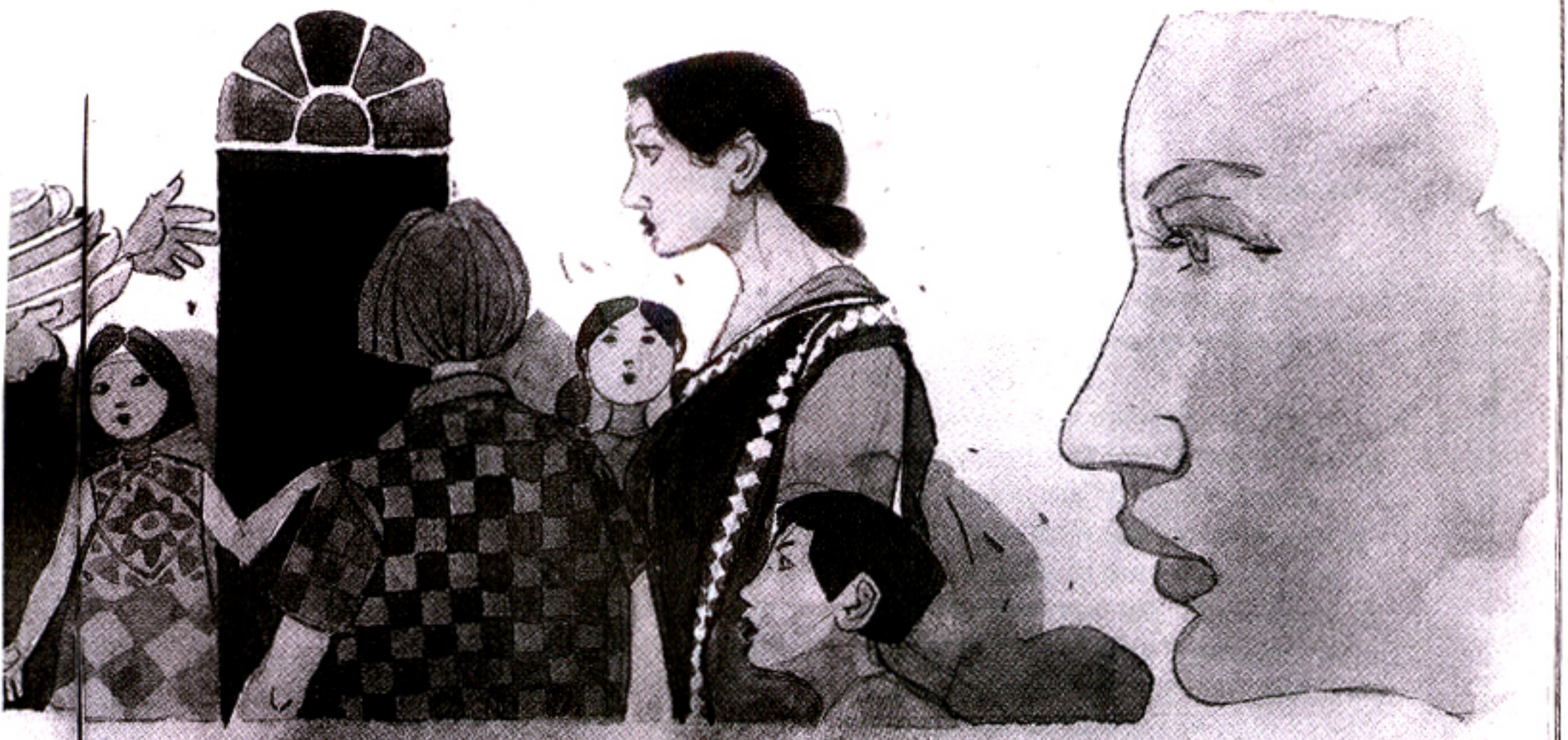

সঙ্গে জানতে চায়, "পুজোর ঘরে আর কে-কে আছেন?"

"কেউ না, মা একা।"

"একা?" কেমন অবাক স্বরে বলে অপরিচিতা। তারপর আত্মগতভাবেই বলে, "অথচ এমন একসময় ছিল যখন মামণির পুজোর ঘরটা সকাল-সন্ধ্যায় জমাট হয়ে থাকত। ভজনের সুর আর ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটাকে স্বর্গপুরী বলে মনে হত। রানা, তোমার মনে আছে সেসব দিনের কথা?"

"কিছু-কিছু মনে তো আছেই। কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

"না পারারই কথা। তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় থেকেই হস্টেলে। ছুটিতে যখন আসতে তখন আমিও ছুটি কাটাতে দেশে চলে যেতাম। যার ফলে আমাদের দেখা হতই না। কিন্তু রানা, সত্যিই কি তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? না কি চিনতে চাইছ না?"

ছিঃ ছিঃ, একথা বলছেন কেন?" লজ্জিতস্বরে রানা বলে।

"না, তা নয়। একদিন যে ছিল তোমাদের আশ্রিত, তাকে তো না চিনবারই কথা। বিলেতে থেকে তুমি কত বদলে গেছ। অথচ, এমন একদিন ছিল দলে আমাকে না পেলে তুমি খেলতেই না। আমার হাতে ফোঁটা না নিলে ভাইফোঁটা তোমার কাছে অসম্পূর্ণ থেকে যেত।"

"গীতা! তুই গীতা!" নিমেষে চিৎকার করে ওঠে রানা। "কী করে চিনব বল, আমি যে গীতাকে চিনতাম তার সঙ্গে এখনকার তোকে মেলাব কী করে?" বলেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে গীতার দিকে তাকিয়ে থাকে রানা। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, "তুই এখন কী করছিস?"

মুচকি হেসে গীতা বলে, "আমি এখন মফস্বলের একটা কলেজে পড়াই।"

"কী পড়াস?"

"ফিজিক্স।"

ফিজিক্স? নিজের মনেই বলে রানা। চমকের উপর চমক। তারপর একমুহূর্তে ফিরে যায় কুড়ি বছর আগের জীবনে। গীতা কলেজে... যে গীতা একদিন তাদের বাড়িতে কাজ করত!

তখন তাদের একান্নবর্তী পরিবার। দাদু, ঠাকুমা, পিসি, কাকা, জ্যাঠা, তাদের বউয়েরা, ছেলেমেয়েরা। মস্ত বড় সংসার। খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই-বোনেরা বড় উদ্ধত, বড় ঝগড়াটে। শুধু তাই নয়, তাদের সংসারে ঝগড়াঝাটি, অশান্তি লেগেই থাকত সবসময়। বড়রা যখন ঝগড়া করত তখন প্রথম-প্রথম রানার খুব মজা লাগত, হাসি পেত। কিন্তু পরে খুব বিরক্ত হত। সংসারের এরকম পরিস্থিতি রানাকে ছেলেবেলা থেকেই বয়স্কদের মতো গম্ভীর করে দিয়েছে।

বাড়িতে সবচেয়ে অশান্তি হত কাজ করা নিয়ে। তার মধ্যেই রানা দেখত, তার মা আর ঠাকুমা মুখ বুজে সব কাজ করে যাচ্ছে, এইসব অশান্তি যেন তাদের স্পর্শই করত না। জেঠিমা, কাকিমা কাজের লোকেদের মানুষ হিসাবে গণ্যই করত না। তাদের দেখাদেখি তাদের ছেলেমেয়েরাও।

এরই মধ্যে একদিন, রানার স্পষ্ট মনে আছে,

সেদিনটার কথা। তাদেরই এক কর্মচারী একটা কালো, রোগা বাচ্চা মেয়েকে (বড়জোর আট-ন'বছর হবে) নিয়ে এল তাদের বাড়িতে কাজ করবে বলে।

মেয়েটাকে দেখেই মা বলে উঠল, "এ কী রে রামু, এ তুই কাকে এনেছিস? এইটুকু বাচ্চা মেয়ে কী কাজ করবে?"

রামু বেশ গর্বের ভঙ্গিতে বলে, "ও সব পারে বউদি, আপনি রেখেই দেখুন না!"

মা ইতস্তত করে ঠাকুমাকে ডেকে আনে। "দ্যাখো মা, রামু কাকে নিয়ে এসেছে! এইটুকু মেয়েকে কি রাখবে?"

ঠাকুমা বলল, "নিয়েই যখন এসেছে, তখন রেখেই দাও! হাতে হাত লাগিয়ে যা পারবে টুকটাক করবে।"

ঠাকুমার ইচ্ছানুযায়ী সেদিন থেকে তাদের বাড়িতে বহাল হল গীতা। গীতা ছোট হলে কী হবে, খুবই কাজের। সত্যিই সব পারে, কোনও কাজে না নেই। যে যা বলে সব হাসিমুখে করে যায়।

রানারা তখন অনেকগুলি ভাইবোন। বিকেল হতে-না-হতে হয় ছাদে নয়তো উঠোনে খেলতে শুরু করত। তখনও বাড়ির বাইরে তাদের যাওয়া বারণ ছিল।

একদিন সকলে খেলছে রানা দেখল, গীতা এসে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই বয়সী গীতা। রানার হঠাৎ কী মনে হল, গীতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গীতা, আমাদের সঙ্গে খেলবি?"

গীতা উৎসাহে মাথা নাড়ে। সবাই মিলে খেলায় মেতে ওঠে। সারাটা বিকেল যে কোথা দিয়ে কেটে যায় কেউই টের পায় না।

দ্বিতীয় দিনেও সকলে ওইরকম হিহি করে খেলল। কিন্তু বিপত্তি ঘটল তৃতীয় দিনে। হঠাৎ রানার খুড়তুতো ভাই তিনু বলল, "গীতা খেললে আমি খেলব না?"

অন্যরা বলে, "কেন?"

তিনু বলে, "গীতা কাজের লোক। ও তো আমাদের বাড়িতে কাজ করে। ওর সঙ্গে আমরা খেলব কেন? ওর সঙ্গে এই দু'দিন খেলেছি বলে মা আমাকে খুব বকেছে।" তারপর অন্য সকলের উদ্দেশ্যে তিনু বলে, "এই তোরাও খেলবি না! জানিস না ওরা ছোটলোক! আমরা বড়লোকের ছেলে, আমরা ওর সঙ্গে মিশব কেন বল?"

রানা তাকায় গীতার দিকে। তার মনে হল, এক নিমেষে গীতার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। বড় বড় কালো চোখ দুটোতে জল টলটল করছে। রানা হতভম্ব হয়ে পড়ে। কী করবে দিশা পায় না। নীরবে লক্ষ করে গীতাকে। সে তখন ছাদের রেলিং ধরে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

গীতার মুখে কোনও কথা ছিল না, কোনও প্রতিবাদও ছিল না। সে জানে সে কাজের লোক। এখানের কোনও কিছুর ওপর তার কোনও অধিকার নেই।

রানার এখনও ভাবতে অবাক লাগে, ওইটুকু বয়সের একটা মেয়ে কীভাবে তখন থেকেই বুঝতে শিখে গিয়েছিল সব। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, শুধু মেনে নেওয়া।

রানার আর খেলতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, সবাই দিব্যি মজা করে খেলছে। তার নিজের ভাই-বোন, বাপ্পা, মউ, ওরাও দলে রয়েছে।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে রানার ঘুম আসছিল না, শুধুই ছটফট করছিল। মা কাজ সেরে ঘুমোতে এসে দেখে, রানা তখনও জেগে। বাপ্পা, মউ ঘুমে বিভোর। মা সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে বাবা, এখনও ঘুমোসনি যে? সন্ধে থেকেই দেখছি মুখটা তোর ভার-ভার, কী হয়েছে বল তো?"

বিকেলবেলার সমস্ত ঘটনা মাকে জানিয়ে রানা প্রশ্ন করে, "যারা আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসে তারা কি সবাই ছোটলোক? ওদের সঙ্গে কি ভাল ব্যবহার করতে নেই?"

"ছিঃ বাবা, ওকথা বলতে নেই। তা হবে কেন? অবস্থার চাপে পড়েই তো আজ ওরা আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছে। এখন আমাদের অবস্থা ভাল বলে সেই সুযোগ নিয়ে ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে খুবই অন্যায় করা হবে বাবা।" আবার একটু থেমে মা বলল, "তুমি একবার ভাবো তো ওই যে গীতা, কতটুকু বাচ্চা মেয়ে, সে তার বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন সবাইকে ছেড়ে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের জন্য এখানে সারাদিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এখানে আমরা যদি ওকে একটু ভাল না বাসি তা হলে ও থাকবে কী করে? ওরাও তো আমাদের মতোই মানুষ বাবা!"

ইতিমধ্যেই মায়ের গলা পেয়ে বাপ্পা, মউ দুজনেই জেগে গেছে। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, "তোদের মতোই ওরও থাকার কথা ওর নিজের বাড়িতে। অথচ আমাদের দেশের এমনই অবস্থা যে, ওইটুকু শিশুকে দিয়েও আমাদের কাজ করাতে হয়।"

বাপ্পা শুনে জিজ্ঞেস করল, "মা, ওর সঙ্গে কি আমরা খেলব না?"

"কেন রে, নিশ্চয়ই খেলবি!"

"সবাই ওদের ছোটলোক বলে কেন? সত্যিই কি ওরা তাই?"

"না বাবা। মানুষ ছোট-বড় হয় নিজের কাজের জন্য। কারও বেশি টাকা-পয়সা থাকলেই সে বড় মানুষ হয় না। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, কারও মনে দুঃখ দিয়ে

স্বপ্নপুরী

কোনও কথা বলতে নেই। এতে ঠাকুর রাগ করেন। না, না, আর কোনও কথা নয়, এবার ঘুমিয়ে পড়ো।"

পরদিন তিনুরা কিছুতেই গীতাকে খেলতে নিল না। অগত্যা দুটো দল হয়ে গেল। একদিকে রানা, বাপ্পা, মউ আর গীতা, অন্য দলে তিনু, নিমুরা।

ছোটকাকার ছেলে বাবু সুযোগ পেলেই গীতাকে মারত। কাকিমা কক্ষনো বাবুকে বকত না। অশান্তির ভয়ে তার মা-ঠাকুমাও ছোটকাকিকে কিছু বলতে চাইত না। মা নিষ্ফল আক্রোশে শুধু ছটফট করত, আর গীতাকে বুক দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করত।

রানা লক্ষ করে, মা গীতাকে কাছে বসে থেকে খাওয়ায়। যে কাজগুলো একটু ভারী গোছের সেগুলো মা গীতাকে না দিয়ে নিজেই করে। বাড়ির অন্যান্যরা সব সময় একটার-পর-একটা কাজের অর্ডার দিত গীতাকে, এক মিনিটও তাকে বসতে দেখতে পারত না। মায়ের কড়া হুকুম তাদের তিন ভাই-বোনকে, "দ্যাখো, নিজের কাজ তোমরা সব নিজেরাই করবে, নইলে জীবনে মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে না।" মা অবসর সময় মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে শোনাত। কীভাবে দেশবন্ধু দেশের জন্য সব বিলিয়ে দিয়েছিলেন, কিংবা বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা, তাঁর মাতৃভক্তি, গান্ধীজির অসুস্থ মানুষের সেবা করা...এরকম হাজারো কাহিনী শুনতে-শুনতে রানারা তন্ময় হয়ে যেত। মা কাহিনী শেষ করেই বলত, "আমি চাই, তোমরা ঠিক এরকম হও, মানুষের মতো মানুষ হও।"

ইদানীং মা খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিল মাদার টেরিজার। মা বলত, "দ্যাখ, মাদার লক্ষ-লক্ষ লোকের নি:স্বার্থভাবে সেবা করে যাচ্ছেন। আমরা কি একজনকেও একটু শান্তি, একটু ভালবাসা দিতে পারি না! হয়তো কোনও-কোনও ক্ষেত্রে অসুবিধে ঘটবে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা তো করতে হবে।"

মায়ের কথা শুনতে-শুনতে তারাও যেন অন্য জগতে চলে যেত, তখন গীতাকে আর কাজের মেয়ে বলে মনে হত না। এভাবেই ওকে ছোটবোনের মতো ভাবতে ভাল লাগত তাদের।

তাদের তিন ভাই-বোনকে নিয়ে মা যখন পড়াতে বসত, তখন গীতা চুপ করে একধারে বসে থাকত। মা একদিন তাকে ডেকে আদর করে জিজ্ঞেস করল, "গীতা, তুই পড়বি?"

"হ্যাঁ।" আস্তে করে মাথা নাড়ে গীতা।

মা হেসে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, গীতা মানে জানিস? গীতা মানে কর্ম। মানে কাজ করে যাও।"

সেদিন থেকে শুরু হল গীতার পড়া। ওর পড়ায় অসম্ভব মনোযোগ। সামান্য সময়ও গীতা অপচয় করত না, বই নিয়ে বসে যেত। মা ওর পড়ার আগ্রহ দেখে খুশি হয়ে নিজেই তার আরও বেশি কাজ করে দেয়। মা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল, কিন্তু বাড়ির কাজের জন্য যেতে পারত না। মা বলল, "দরকার নেই। তুই বাড়িতেই পড়। তোকে দিয়ে একেবারে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়াব।"

গীতার পড়ার ব্যাপারে মায়ের উৎসাহ দেখে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা, যেমন কাকিমা-জেঠিমারা আড়ালে মুখ টিপে হাসাহাসি করত। "একটা কাজের লোককে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ভাল না। উঃ, মেয়ে যেন দিগগজ হবে!" মা সমস্ত বিদ্রূপ হাসিমুখে সহ্য করত। তার যেন কথাগুলো গায়েই লাগত না। কিন্তু এজন্যই বোধ হয় ভেতরে-ভেতরে মায়ের জেদ আরও বেড়ে গেল।

ষষ্ঠীর দিন মা তাদের সব ভাই-বোনের হাতে হলুদ সুতো বেঁধে দিত। নতুন জামা এনে দিত। গীতাও বাদ পড়ত না। গীতা মাকে প্রণাম করত। মা আশীর্বাদ করে বলত, "মানুষ হও!" ভাইফোঁটার দিনও মা গীতাকে ডাকত রানাদের সবাইকে ফোঁটা দেওয়ার জন্য। তিনু, নিমু, ওরা কিছুতেই গীতার হাত থেকে ফোঁটা নিত না। রানা, বাপ্পা সারাবছর ধরে টিফিনের পয়সা থেকে কিছু-কিছু বাঁচাত, এই দিনটার জন্য। যত সামান্যই হোক, ওইদিন কিছু কিনে আনত বোনেদের জন্য। গীতাও নিজের মাইনের টাকায় রানা ও বাপ্পার জন্য কিছু-না-কিছু কিনে আনতে কখনও ভুলত না।

একবার ভাইফোঁটার সময় হঠাৎ তিনুও আবদার করল, সে গীতার হাত থেকে ফোঁটা নেবে। কিন্তু যেই না গীতা ফোঁটা লাগাতে গেছে অমনি কোথা থেকে কাকিমা এসে হাজির। কাকিমা অকথ্য ভাষায় গীতাকে গালাগাল করে তিনুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, "এ সমস্ত অনাচারের মূলে রানার মা। অনেকদিন ধরে তারা এসব সহ্য করেছে কিন্তু আর নয়। এর একটা বিহিত দরকার। ইচ্ছে হলে তারা আলাদা বাড়িতে থেকে এসব করতে পারে।" ভাইফোঁটার দিন যে সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, এক নিমেষে তা যেন ধুলোর ঝড়ে ঢেকে গেল। রানার মনে হল, কে যেন তার গায়ে গরম সিসে ঢেলে দিয়েছে। নিমেষের মধ্যে রানা স্বর্গ থেকে 'ঝগড়াটেদের আস্তানায়' এসে পড়ল।

অনেকদিন আগে রানার বাবা একটা জমি কিনেছিলেন। কিন্তু বাড়ি করেননি। এবার মায়ের উদ্যোগে শুরু হল বাড়ি। মা দিনরাত বাড়ি তৈরি নিয়ে পড়ে রইল। বাড়ি শেষ হলে মা নাম রাখল 'স্বপ্নপুরী'। এইরকম একটা বাড়ির কথা মা এতদিন প্রায়ই বলে এসেছে। আজ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে তার সে কী আনন্দ! নির্দিষ্ট দিনে

স্বপ্নপুরী

গৃহপ্রবেশ হল। মা জোর করে ঠাকুমাকে নিয়ে এল তাদের সঙ্গে।

মায়ের স্বপ্নপুরী সত্যিই স্বপ্নপুরী। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায় রানার। বাড়ির চারদিকে ফল-ফুলের বাগান, মাঝখানে উজ্জ্বল সাদা রঙের বাড়ি। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় বাড়িটাকে রানার সত্যিই স্বপ্নপুরী লাগে। সবচেয়ে টানে ছাদের শূন্য উদ্যান, ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেই রানার দাদুর মুখে শোনা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের কথা মনে পড়ে। এই শূন্য উদ্যানে যে কত রকমের ফুল ফুটে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ছাদে গেলেই রানার মনে হত, সে যেন স্বর্গের বাগানে বসে আছে। এখনই অপ্সরা নাচতে-নাচতে আসবে।

এই বাড়িতে আসার পর থেকে জীবনযাত্রার ধরনটাই যেন বদলে গেল। সকলে মিলে সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের গান গাওয়া। ছুটির দিনগুলোতে বাবাও যোগ দিতেন। রানার মনটা যে তখন কোথায় হারিয়ে যেত রানা নিজেই জানে না।

তারপরেই সবাই স্টাডিরুমে। দেখবার মতো পড়ার ঘর। প্রত্যেকের আলাদা বুক শেল্‌ফ, চেয়ার-টেবিল-ডেস্ক। ওই ঘরে একটা অ্যাকোয়ারিয়ামও আছে। চারদিকে বইয়ের আলমারি, শুধু বই আর বই।

মা যত্ন করে সবাইকেই পড়াতেন, এমনকী, গীতা ও রামুকেও।

এখানে এসে মায়ের ভিন্নরূপ। মা প্রতিদিন ফুল দিয়ে কী সুন্দর করে যে ঘর সাজায়! প্রতিদিন মা নতুন-নতুন টিফিন, রাতের জন্য নতুন-নতুন খাবার বানায়। মাসের মধ্যে যে-কোনও একটা ছুটির দিনে সবাই মিলে গাড়ি করে হইহই করে বেড়াতে বেরিয়ে পড়া।

বাবা বলতেন, "একটাই তো জীবন। একে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা উচিত।"

রানা একদিন ছাদের শূন্য উদ্যানে দাঁড়িয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, তুমি সমস্ত কাজের লোকের সঙ্গেই সুন্দর ব্যবহার করো, কেন?"

"মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কি করতে আছে! আর ওরা যে বড় দুঃখী মানুষ বাবা!"

"সবাই এ-কথাটা বোঝে না, না মা?"

"তোমরা বোঝো! আমি চাই তোমরা যেন অন্যের সুখ-দুঃখ-বেদনাকে নিজের বলে ভাবতে পারো, সত্যিকারের মানুষ হতে পারো তোমরা।"

তারপরেই স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে মা বলল,"এই পৃথিবীতে অনেক দুঃখ কষ্ট বাবা। সবসময় চেষ্টা করবে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে। শুধু তুমি হাসবে, আর তোমার কাছের মানুষজন চোখের জল ফেলবে এ তো হয় না বাবা!"

গোধূলির আলোয় মাকে দেবী প্রতিমার মতো মনে হয় রানার। হঠাৎ মাকে প্রণাম করে রানা বলে ফেলে, "মা, তোমাকে কেমন ঠাকুর-ঠাকুর লাগে।" মা হেসে বুকে জড়িয়ে ধরে রানাকে।

দিন গড়িয়ে চলে। দেখতে-দেখতে একদিন গীতা প্রাইভেটে মাধ্যমিক দেয়। আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করে। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি করানো হল গীতাকে। মায়ের তখন অনেক আশা, গীতা অনেক বড় হবে।

আজ মায়ের স্বপ্নের সার্থক রূপকে চোখের সামনে দেখে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে রানা। অতীতটা চোখের সামনে ছবির মতো ভাসতে থাকে। সংবিৎ ফেরে মায়ের ডাকে, "রানা, চুপ করে আছিস কেন রে? দেখেছিস গীতা আমাদের কত বড় হয়েছে!"

গীতার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছিস রে তুই? মা ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ। ভাল আছেন।"

"কলেজে পড়ানো ছাড়া আর কী করিস? বাড়ির কাজকর্ম, রান্নাবান্না কে করে?"

"আমিই মামণি।"

রানার মনে পড়ে গীতা মাকে মামণি বলেই ডাকত।

"আমি কোনও কাজের লোক রাখিনি মামণি। লোক রাখতে গেলেই নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে, তখন বড় কষ্ট হয়, তাই...।"

মা বলে, "সেজন্যই তো তোর লোক রাখা উচিত রে গীতা।"

গীতা ঠিক বুঝতে পারল না দেখে মা বলল, "তুই একটা বাচ্চা মেয়েকে তোর কাছে এনে রাখ, তাকে তোর মতো করে মানুষ করে তোল, একজনের অন্তত দুঃখ ঘুচুক!"

গীতা লজ্জিত হয়ে বলে, "এদিকটা আমি একদম ভেবে দেখিনি মামণি। নিশ্চয় রাখব, ফিরে গিয়েই রাখব!"

ঠিক এই সময় ডোর বেলটা বেজে ওঠে আবার। দরজা খুলতেই ঘরে ঢোকে মউ। সঙ্গে একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ে। তার হাতে বই-খাতা। বই-খাতাগুলো মাকে দেখিয়ে বলে, "পারুলের জন্য এগুলো কিনে আনলাম মা।"

ছবি: অনুপ রায়